পুণ্যপদপরশে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন

সৌমেন রক্ষিত

বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিতি তুঙ্গে নিয়ে আসেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। 'উদ্বোধন' থেকে প্রকাশিত আকরগ্রন্থগুলি বাদ দিলে এই গ্রন্থটি পাঠকসমাজে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত জনপ্রিয় একটি গ্রন্থ। এর বহু পূর্বে আর একটি গ্রন্থ পাঠকসমাজে সাড়া ফেলেছিল। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের কাছে পুঁথির মতো করে দ্বিপদী, ত্রিপদী পয়ার ছন্দে সহজ-সরল ভাষায় লেখা অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' (সম্পূর্ণ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) সবিশেষ জনপ্রিয়। 'পদ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ' (১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ) ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)—এই গ্রন্থদুটি যদি না-ও লিখতেন, তবু কেবল পুঁথিটির জন্যই অক্ষয়কুমার বেঁচে থাকতেন যুগ যুগ ধরে।

অক্ষয়কুমারের জন্ম বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত জয়পুর থানার ময়নাপুর গ্রামে। অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাশুক অক্ষয়কুমার সেন' গ্রন্থে ময়নাপুর সম্পর্কে লিখেছেন, ''পরবর্তী কালে অক্ষয়ের জন্মস্থানের এলাকাটি 'বাজে ময়নাপুর' নামে অভিহিত হয় এবং একটি পৃথক গ্রামে পরিণত হয়। পুরোনো দলিলে উল্লিখিত 'বাজি' ময়নাপুর মৌজা 'বাজে' ময়নাপুরে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারে অথবা ঐ মৌজা কোনো সময় বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ব'লে 'বাজে' ময়নাপুর নাম হতে পারে। বৃহত্তর ময়নাপুরের গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনসমাজ ঐ এলাকাকে 'ময়নাপুর সেনপাড়া' নামেই অভিহিত করে থাকে। বর্তমানে গ্রামটি 'অক্ষয়পল্লী' নামাঙ্কিত হয়েছে।''

অক্ষয়কুমার সেনের জন্ম ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে[১]। পিতামহ গদাধর সেন, পিতা হলধর, মাতা বিধুমুখী। হলধরের তিন পুত্রের মধ্যে বড় অক্ষয়কুমার। তাঁর প্রথম পত্নী ইন্দাসের রোলগোপালনগরের বাসিন্দা। তিনি পনেরো বছর অপুত্রক থেকে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় পত্নী বাঁকুড়ার সুদিষ্ঠা গ্রামের অধিবাসী। তিনি দুই পুত্র গোপালকিঙ্কর, গৌরীকিঙ্কর এবং এক কন্যার জননী হয়েছিলেন।

শীর্ণদেহ, কৃষ্ণকায় অক্ষয়কুমারকে রূপবান বা বিদ্বান কোনওটাই বলা চলে না। পাঠশালাতেই তাঁর প্রথাগত বিদ্যার শেষ। মায়ের কাছ থেকে একটি মাত্র পয়সা সম্বল করে তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য কলকাতায় চলে আসেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শিক্ষকতার বৃত্তি পেয়ে যান জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। ঠাকুর পরিবারের ছোট ছোট

ছেলেমেয়েদের মাস্টারমশাই, তাই পরিচিতি লাভ করেন 'অক্ষয় মাস্টার' হিসেবে।

অভাব তাঁকে কোনওদিন ছাড়েনি। আহিরীটোলার ছোট্ট ঘরটিতে তাঁর কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন অতিবাহিত হয়। ছাত্র পড়িয়ে সামান্য কটি টাকা দিয়েই তাঁকে সংসার চালাতে হত। অথচ ভেতরে ছিল প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষুধা। কী এক অদম্য ব্যাকুলতা তাঁকে গ্রাস করেছিল সেইসময়ে। একদিন ঠাকুরবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথায় উঠে আসে পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ। অক্ষয়কুমারের ইচ্ছে জাগে পরমহংস দর্শনের। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখালেন না। অক্ষয়কুমারও ছাড়বার পাত্র নন। দেবেন্দ্রনাথকে খুশি করার জন্য প্রতিদিন ভোরে দেবেন্দ্রনাথের হুঁকোটি তামাক সাজিয়ে রেখে দিতেন। একদিন তিনি ধরা পড়লেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ রাজি হলেন অক্ষয়কুমারকে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে নিয়ে যেতে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'তে তিনি লিখেছেন,

''পুলকে অন্তর ভরি, আনাইয়া ঠিকা গাড়ি
গৃহী ভক্ত দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
ধীরেন্দ্র তাঁহার সাথে, বাহির হইয়া পথে,
যাইবারে করেন উদ্যম॥
অধম এমন কালে, শ্রীপ্রভুর কৃপাবলে,
উপনীত হইল তথায়।
কাকুতি সহিত কাঁদে, দোঁহার চরণ ছেঁদে,
লয়ে যেতে শ্রীপ্রভু যেথায়॥''[২]

ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর কাশীপুরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ঠাকুরবাড়ির ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারও আসেন। অক্ষয়ের এতদিনের ব্যাকুলতা শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। সেদিন রাত্রে ফেরার পথে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন অপর এক ভক্ত রামচন্দ্র দত্তকে। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে আরও বিহ্বল হয়ে ওঠেন অক্ষয়কুমার। এবার থেকে তিনি নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলেন।

মন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন অক্ষয়কুমার, অথচ প্রথমদিনের প্রণাম ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সচরাচর তাঁর প্রণাম গ্রহণ করেননি। অক্ষয়কে পা স্পর্শ করতে দিতেন না তিনি। এমনকী অক্ষয়ের ছোঁয়া খাবারও খেতেন না। অথচ দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের গৃহে এক কোণে বসে থাকতেন তিনি। কী অপরিসীম ধৈর্য! অনেক আশা নিয়ে বসে থাকতেন, একদিন না একদিন তো ঠাকুরের কৃপা হবেই!

অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন, ''আমি পরমহংসদেবকে একদিনও কোন কথা বলিনি বা কিছু জিজ্ঞেসও করিনি, তবে এইটি জানতাম যে, তিনি যার বুকে হাত দেন, সে তখনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, আর ঐ অবস্থায় সে কৃষ্ণ দেখতে পায়। আমি ঐ আশায় তাঁর কাছে যেতে লাগলাম—শুধু যে ঐ আশায় তাও নয়, তাঁকে দেখলে কেমন কেমন হতুম, তাই যেতুম, আর মনে মনে ভাবতুম, কবে কৃপা করে আমার বুকে হাত দেবেন। কত দিন গেল, তিনি আর বুকে হাত দেন না। আমি আশা করে যাই আর নিরাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসি। জীবনে মোটে দুটি কথা তাঁকে বলেছিলুম। একবার একদিন তাঁকে নির্জনে পেয়ে বলেছিলুম, ঠাকুর, আমি বড় কানা। তাতে তিনি জবাব দিলেন, ঈশ্বর আছেন। আর একদিন তাঁকে বলেছিলুম—ঠাকুর, আপনি আমার ছোঁয়া কুলফী খেলেন না—আমি বড় অপরাধী। তাতে তিনি মুচকি হেসে বললেন, তুমি যদি দুপুর বেলায় কুলফী আনতে, তা হলে খেতুম; ঠাণ্ডা জিনিস রেতের বেলা খেলে অসুখ হবে, তাই খাইনি। আমার সঙ্গে ঠাকুর যে রকম ব্যবহার করতেন, এমন যদি অন্য কোন

লোকের সঙ্গে হতো, তাহলে সে প্রাণ গেলেও আর তাঁর কাছে যেত না। কত লোকে তাঁর পায়ে হাত বুলাচ্ছে আর আমি হাত বাড়ালেই অমনি, হয়েছে হয়েছে বলে পা গুটিয়ে নিতেন। কখনো কখনো পদরজ নিতে গেলে পেছিয়ে চলে যেতেন আর বলতেন, 'হয়েছে, হয়েছে'। তিনি যে এত তত্ত্ব-কথা বলতেন, আমি তার কিছুই বুঝতে পারতাম না, একধারে চুপ করে বসে থাকতাম, আর তাঁকে খালি দেখতাম। আমার বাপকে আমি যেমন ভয় করতাম ঠাকুরকে তেমনি ভয় করতাম। আমার বাপের মুখের আদল ঠাকুরের মুখে দেখতে পেতুম ও এখনও পাই।... আমার শাস্ত্র—রামকৃষ্ণদেব; আমার জ্ঞান—রামকৃষ্ণদেব।"[৩]

কী নিদারুণ মনোবেদনা নিয়ে অক্ষয়কুমার সেন ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসে থাকতেন অথচ ওই পদযুগল ছুঁতে পেতেন না। প্রতিদিন ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন। পরদিন আবার আসতেন নব আশায় বুক বেঁধে। ঠাকুর হয়তো অক্ষয়কুমারকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে এই অনুমানের সমর্থন পাই : ''ওর নাম অক্ষয় সেন। বাঁকুড়া অঞ্চলে ঘর। কদাকার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ নাম দেন শাকচুন্নি মাস্টার। ভক্তিভরে প্রণাম করিতে গেলে ঠাকুর পিছনে হটে যান দেখে মনঃকষ্ট হল। বলিলাম, আমরা তো আপনাকে ভক্তি করতে জানি না, তথাপি আমাদের ভালোবাসেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে ছুঁতেও দেন না কেন? ঠাকুর কহেন—ও একটা আছে রে! সবই কি সমান? আসুক যাক, মনের ময়লা কাটুক, এর পর হবে।"

অপর একটি ঘটনাতে অক্ষয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। পুঁথিকার নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন পুঁথিতে। ৬ এপ্রিল ১৮৮৫-র ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে। এখানে অক্ষয়কুমার আমন্ত্রিত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গসেবার জন্য। পুঁথিতে পাই—

''সকলে যাইলে পরে, শ্রীঅঙ্গে কে সেবা করে,
সেইহেতু দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
করুণার নাহি ওর, চির ইষ্টাকাঙ্ক্ষী মোর,
আমারে করিলা আবাহন॥...

কল্পতরু প্রভু কিসে, শুন কহি সবিশেষে,
পদ-প্রান্তে পাখা করি তাঁয়।
বাসনা হইল মনে, সেবিবারে শ্রীচরণে,
স্বেচ্ছায় যদ্যপি দেন রায়॥
তখনি দক্ষিণেতর, শ্রীপদ শ্রীগুণধর,
প্রসারণ কৈলা মম কোলে।
কমলার সেব্য পাদ, সেবিয়া মিটানু সাধ,
জনম সফল ধরাতলে॥"[৪]

আরও এক দিনের কথা জানা যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' থেকে : ''আমিও কিছু বুঝতেম না, তবে যেদিন পরমহংস ঠাকুর থিয়েটারে ডান পা-টি বাড়িয়ে দিয়ে সমাধিস্থ হলেন, আর গিরিশবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'আয় কে কোথায় আছিস, শীঘ্র পায়ের ধুলো নে', আমি তাড়াতাড়ি এসে পায়ের ধুলো নিলুম আর বললুম (সে সময় চোখে একফোঁটা জলও এল), 'ঠাকুর, কৃপা কর।' "[৫]

এই ঘটনাটি তিনি পুঁথিতে লেখেননি। তবে অক্ষয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেছেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক বিশেষ দিন। অন্ত্যলীলাক্ষেত্র কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু। শ্রীরামকৃষ্ণ দোতলা থেকে নামছেন। পরনে লালপেড়ে ধুতি, সবুজ বনাতের জামা, মাথায় কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা, পায়ে চটি-মোজা। অক্ষয়কুমার তখন সঙ্গীদের সঙ্গে

বানর-বানর খেলা খেলছিলেন। ঘটনাটি তাঁর বর্ণনায় :

''হঠাৎ দাঁড়াইয়া পথে শ্রীগিরিশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে কিবা লয় মন॥
গিরিশ পাতিয়া জানু বসি পদমূলে।
করজোড়ে সম্ভাষিয়া প্রভুদেবে বলে॥
আমি ছার কি বলিব আপনার কথা।
শুক ব্যাস বিবরণে পরাভব যেথা॥
উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর॥
পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে॥
কিছু পরে বাহ্যচেঁঠা উদিলে শ্রীগায়।
ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায়॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি॥
পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে।
দাঁড়িয়ে আছিনু মুই অনেক তফাতে॥
দূরে থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিয়া বক্ষের উপরে॥''[৬]

বলা বাহুল্য সেদিন ঠাকুর অনেকের ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু দু-এক জনকে তা থেকে বঞ্চিতও করেছেন, বলেছেন—এখন নয়, পরে হবে। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমার ভাগ্যবান, ঠাকুর তাঁকে কৃপা করেছিলেন।

লক্ষণীয়, যে-তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে অক্ষয়কুমার ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য হতে চেয়েছিলেন, তা সফল হয়েছিল। শত পরীক্ষার পর তিনি জয়ী হয়েছেন। অবশেষে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি পেলেন। 'এর পর হবে'—ঠাকুরের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও মিলে যায়—শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরে গেঁথে পুঁথিরচনায় অক্ষয়কুমারের সফলকাম হওয়ার ঘটনায়। এই সফলতার পেছনেও সেই অদ্ভুত নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ভক্তি। অক্ষয়কুমার পরে জানিয়েছেন, ''রামকৃষ্ণদেবের সব অলৌকিকত্ব। তাঁর গোটা জীবনটি অলৌকিকত্বে ভরা। তাঁর লৌকিকত্ব কিছুই নেই। তাঁর কথা এখন পর্যন্তও কিছুই হয়নি। আমি যখন লীলাকথা বলব, তখন তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব যে, আজ পর্যন্ত অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হবার পূর্বে যত অবতার হয়েছেন, আর তাঁরা যা করেছেন একা রামকৃষ্ণদেব সেই সব করেছেন, আবার তার চেয়ে কিছু বেশি করেছেন।''[৭] বস্তুত অক্ষয়কুমার পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে এত ভালবাসতেন। স্বামীজী এক পত্রে লিখেছেন, ''শাঁকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তাকে আমার লক্ষ-লক্ষাধিক প্রেমালিঙ্গন দিবে। তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী! শাঁকচুন্নী ঐ পুঁথি সকলকে শোনাক। মহোৎসবে শাঁকচুন্নীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। পুঁথি অতি বড় যদি হয় তো চুম্বক চুম্বক করে যেন পড়ে। শাঁকচুন্নী একটাও আবোল-তাবোল তো লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব! শাঁকচুন্নীর পুঁথি যাতে খুব বিক্রি হয়, সকলে পড়ে (মিলে) চেষ্টা করবে। তারপর শাঁকচুন্নীকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করতে যেতে বলো। বাহবা, সাবাস, শাঁকচুন্নী! সে তাঁর কাজ করছে। গাঁয়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তাঁর কথা শোনাক—এর চেয়ে তার আর কি ভাগ্য হবে? ...শশী, শাঁকচুন্নীর পুঁথি and শাঁকচুন্নী himself (নিজে) must electrify the masses (জনসাধারণে শক্তিসঞ্চার করবে)। আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই! প্রভু তোর কণ্ঠে বসুন, দ্বারে দ্বারে তাঁর নাম শুনাও। সন্ন্যাসী হবার আবশ্যক কিছুই নাই। শশী, mass (জনসাধারণ)-এর মধ্যে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। শাঁকচুন্নী is the future apostle for the masses of Bengal (বাঙলার জনসাধারণের

নিকট ভাবী বার্তাবহ)। শাঁকচুন্নীকে খুব যত্ন করবে! তার বিশ্বাস-ভক্তির ফল ফলেছে।...”[৮]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির উচ্চ প্রশংসা এভাবেই করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বোঝা যায় কী পরিমাণ ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা থাকলে এ জাতীয় কর্ম সম্পাদন করা যায়। পরবর্তী কালে গ্রন্থটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থে পরিণত হয়েছে। স্বামী প্রভানন্দজী ‘শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা’ লিখতে গিয়ে বারে বারে পুঁথি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই অক্ষয়কুমার তাঁর পুঁথি রচনার কাজ শুরু করেন।[৯] পুঁথি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও পুঁথি রচয়িতার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত পরিসরে।

অক্ষয়কুমার পরবর্তী কালে কিছুকাল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং তারপর নিজের গ্রামে গিয়ে ঠাকুরের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

শ্রীরামকৃষ্ণের যে-রহস্যময় আচরণ অক্ষয়কুমারের মনে হতাশার জন্ম দিয়েছিল, তা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অক্ষয়কুমার তাঁর মনের ইচ্ছাকে নষ্ট করেননি কিংবা অকারণে ধৈর্য হারিয়ে মধ্যপথে সমাপ্তি ঘোষণাও করেননি। বরং আরও বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। এই সময়ের মধ্যেই তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন ‘ভক্তিমান’ যথার্থ মানুষরূপে। ঠাকুরের কথামতো মনের ময়লা ধুয়ে মুছে ফেলতে সফল হয়েছিলেন তিনি। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ঘটেছে ১ জানুয়ারি ১৮৮৬-তে। যিনি ঘরের এককোণে বসে কেবল ঠাকুরের মুখ দর্শন করতেন, মুখনিঃসৃত ভাব-বাণীর বেশিরভাগটাই যাঁর মাথার উপর দিয়ে চলে যেত বলে স্বীকার করেছেন, সেই অক্ষয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে একখানি বিরাট পুঁথি লিখে ফেললেন, এ কম সাহসের কথা নয়। এই পবিত্রতা, তীব্র ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা অক্ষয়কুমারের জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ যা আমাদের শ্রদ্ধা স্বতঃই আকর্ষণ করে। ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর *‘শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা’* গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের মৃত্যুদিন সম্পর্কে জানিয়েছেন, ‘‘(১৩৩০ সালের ২১ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর, ১৯২৩ শুক্রবার) প্রাতে বেলা নয়টার সময় তিয়াত্তর বৎসর বয়সে বাঞ্ছিত লোকে চলিয়া যান।” এই তথ্য থেকে অক্ষয়কুমারের জন্মসাল দাঁড়ায় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ।

২। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ৪০৩ [এরপর, *পুঁথি*]

৩। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০), পৃঃ ৩০-৩১ [এরপর, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা*]

৪। *পুঁথি*, পৃঃ ৫৩৯

৫। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা*, পৃঃ ৬-৭

৬। *পুঁথি*, পৃঃ ৬১৪-৬১৫

৭। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা*, পৃঃ ৪০

৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র, পৃঃ ৪২০-২১

৯। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ *“The Glory of Sri Ramakrishna”* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ‘‘Shri Akshay Kumar Sen (first) wrote the sacred book “Sri Sri Ramakrishna Punthi” a few chapters of which were already written during the life-time of Sri Ramakrishna.”